أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/T) www.motaher21.net

وَمَن يَرْغَبُ عَن

" সেই নির্বোধ ছাড়া....!!!"

" Those Stupids except .....!!!"

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرٰهِۦمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى الْءَاخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ

সেই নির্বোধ ছাড়া অন্য এমন কে আছে যে ইব্রাহীমের জীবন ব্যবস্থা থেকে ফিরে যাবে এবং নিশ্চয় আমি তাকে পছন্দ করেছি এবং আখিরাতেও সে নেককারদের অন্তর্গত হবে।

১৩০ নং আয়াতের তাফসীর:

নির্বোধরাই ইব্রাহীম (আঃ) এর সরল পথ থেকে বিচ্যুত

কাফিররা যা কিছু নতুন আবিস্কার করে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং মহান আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে অত্র আয়াতসমূহের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ সব মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করে তাদেরকে নির্বোধ ও বোকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো, অথচ তারা পূর্ণ মুশরিক ছিলো। আর ইবরাহীম (আঃ) তো একাত্মবাদীদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাওহীদকে শির্ক হতে পৃথককারী ছিলেন। সারা জীবন চোখের পলক পরিমাণও মহান আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করেন নি। বরং তিনি প্রত্যেক অংশীবাদীকে, প্রত্যেক প্রকারের শির্ককে এবং কৃত্রিম মা ‘বূদকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ কারণেই তিনি স্বীয় সম্প্রদায় হতে পৃথক হয়ে যান, স্বদেশ ত্যাগ করেন, এমন কি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি পরিস্কারভাবে বলে দেনঃ

﴿يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি মুক্ত, তোমাদের শিরকের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আমার মুখমণ্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬ নং সূরা আন ‘আম, আয়াত নং ৭৮-৭৯)

অন্যত্র ইবরাহীম (আঃ) স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ

﴿وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ﴾

‘স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন ইব্রাহীম (আঃ)-স্বীয় পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা যাদের পূজা করো তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। (৪৩ নং সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ২৬-২৭)
অন্য স্থানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ

﴿وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۚ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ﴾

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শুধু সেই ওয়া ‘দার কারণে ছিলো, যে ওয়া ‘দা সে তার সাথে করেছিলো। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেলো যে, সে (পিতা) মহান আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নিলিপ্ত হয়ে গেলো। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ১১৪)

অন্যত্র মহান আল্লাহ রয়েছেঃ

﴿اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۚ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۚ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো এক উম্মাত মহান আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলো না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিলো মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; মহান আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (১৬ নং সূরা নাহল, আয়াত নং ১২০-১২২)

এই আয়াতসমূহের ন্যায় এখানেও মহান আল্লাহ বলেন যে, নিজেদের জীবনের ওপর অত্যাচারকারী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মকে ত্যাগ করে থাকে। কেননা ইবরাহীম (আঃ) কে মহান আল্লাহ হিদায়াতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। আর বাল্যকাল হতেই তাঁকে সত্য অনুধাবনের তাওফীক দান করেছিলেন। 'খালীল' এর ন্যায় সম্মানিত উপাধি একমাত্র তাঁকেই দান করেছিলেন। আখিরাতেও তিনি ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁর পথ ও ধর্মকে ছেড়ে যারা ভ্রান্ত পথ ধারণ করে, তাদের মতো নির্বোধ ও অত্যাচারী আর কে হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ 'নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।' (৩১ নং সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৩)

আবুল 'আলিয়া (রহঃ)এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ইয়াহুদীদের দাবীকেও খণ্ডন করা হয়েছে যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ 'আত সৃষ্টি করেছে এবং মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে দূরে সরে গেছে। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৯২) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۶۷﴾ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

'ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলো না এবং খ্রিষ্টানও ছিলো না, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিলো এবং সে মুশরিকদের অর্থাৎ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং তাঁর সাথের মু' মিনগণ: আর মহান আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।' (৩ নং সূরা আল 'ইমরান, আয়াত নং ৬৭-৬৮)

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ 'তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো', উত্তরে সে বললো, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম'। এই একাত্মবাদের মিল্লাতের উপদেশই ইবরাহীম (আঃ) ইয়া 'কূব (আঃ) তাদের সন্তানগণকে দিয়েছিলো। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র বাণী ووصى بها ابراهيم وبنيه এর মধ্যস্থিত ها সর্বনামটির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়তো বা ملت হবে অথবা كلمة হবে। ملت এর ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম। আর كلمة এর ভাবার্থ হচ্ছে اسلمتلربالعالمين। ইসলামের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভালোবাসা কতো বেশি যে, তাঁরা নিজেরা সারা জীবন তার ওপর অটল ছিলেন এবং তাদের সন্তানদেরকেও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ﴿وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ﴾

এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য। (৪৩ নং সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ২৮)

কোন কোন মনীষী (وَيَعْقُوْبُ) এ রকমও পড়েছেন। তখন এটার সংযোগ হবে بَنِيْهِ এর সাথে। বলা হয়ঃ ‘ইবরাহীম (আঃ) তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তান ইয়া ‘কূব (আঃ) কে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন।’ কুশাইরী (রহঃ) বলেন যে, ইয়া ‘কূব (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ দাবী ভিত্তিহীন, এর ওপর কোন বিশুদ্ধ দালীল নেই। বরং স্পষ্টত জানা যাচ্ছে যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইয়া ‘কূব (আঃ) ইসহাক (আঃ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কেননা কুর’ আনুল হাকীমের আয়াতে রয়েছেঃ

﴿قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ﴾ ‘তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়া ‘কূব এর।’ (১১ নং সূরা হুদ, আয়াত নং ৭১)

তাহলে যদি ইয়া ‘কূব (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান না থাকতেন তাহলে তাঁর নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন থাকতো না। সূরা ‘আনকাবূতেও রয়েছেঃ

﴿وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ﴾

‘আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া ‘কূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুওয়াত ও কিতাব।’ (২৯ নং সূরা ‘আনকাবূত, আয়াত নং ২৭) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً﴾

‘আর আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়া ‘কূব।’ (২১ নং সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৭২)

এই সব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়া ‘কূব (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ

قلت :يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال" :المسجد الحرام"، قلت :ثم أي؟ قال" :بيت المقدس ."قلت :كم بينهما؟ قال "أربعون سنة"

‘আমি বলি, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কোন মাসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়?’ তিনি বলেনঃ ‘মাসজিদুল হারাম।’ আমি বলি, ‘তার পরে কোনটি?’ তিনি বলেনঃ ‘বায়তুল মুকাদ্দাস।’ আমি বলি, ‘এ দু’ টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতো?’ তিনি বলেনঃ ‘চল্লিশ বছর।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-৬/৩৩৬৬, সহীহ মুসলিম ১/১/৩৭০, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৫০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯) বর্ণিত আছে যে, সুলাইমান (আঃ) ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের মেরামতকারী, তিনি এর নির্মাতা ছিলেন না। এ রকমই ইয়া ‘কূব (আঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন অতি সত্বরই আলোচনা আসছে।

আমৃত্যু তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে

এরপর বলা হয়েছেঃ

﴿يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ নবীগণেরও (আঃ) ওয়াসীয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এইঃ ‘তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় সৎ কর্মশীল হও এবং তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকো, যেন মৃত্যুও তার ওপরেই হয়।’ সাধারণ সেই ইহলৌকিক জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার মৃত্যুও এর ওপরেই হয়ে থাকে, এবং যার ওপরেই মৃত্যু বরণ করে তার ওপরেই কিয়ামতের দিন তার উত্থান হবে। মহান আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, যে ব্যক্তি ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তিনি তাকে সেই কাজে তাওফীক প্রদান করেন এবং ঐ কাজ করার জন্য সহজ করে দেন ও তাকে তারই ওপর অটল রাখেন। এই কথাগুলো নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসের বিপরীত নয়। হাদীসটি হলোঃ

"إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعٌ أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها .
"وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

কোন ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসীদের ন্যায় ‘আমল করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এমন হয় যে, যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে তার ও জান্নাতের মাঝে এক বাহু পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে। এমতাবস্থায় কিতাবের লেখাটিই তার ওপর অগ্রগামী হয়ে যায় ফলে সে জাহান্নীদের ন্যায় ‘আমল করে এবং এক পর্যায়ে সে জাহান্নামেই প্রবেশ করে। আবার কেউ কেউ জাহান্নামের কাজ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক হাত কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব থাকে। অতঃপর তার ভাগ্য তার ওপর বিজয় লাভ করে। ফলে সে জান্নাতের কাজ করতে থাকে এবং অবশেষে তা জান্নাতে প্রবেশ করে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৬/৩২০৮, ৩৩৩৬, সহীহ মুসলিম ৪/১/২০৩৬, সুনান আবূ দাউদ-৪/২২৮/৪৭০৮, জামি ‘ তিরমিযী ৪/২১৩৭, সুনান ইবনে মাজাহ ১/৭৬/২৯, মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮২/৪১৪, ফাতহুল বারী ৬/১০৫) কেননা এই হাদীসটি কোন বর্ণনায় সবাব বা কারণ বলা হয়েছে যেঃ

"فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس.

অতঃপর সে জান্নাতীদের ন্যায় ‘আমল করে যা মানুষদের কাছে আবার প্রকাশও করে এবং সে জাহান্নামীদের ন্যায় ‘আমল করে আবার তা জনগণের নিকট প্রকাশ করে।

তাছাড়া মহান আল্লাহ তো বলেছেনইঃ

﴿فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ﴿۵﴾ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۶﴾ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰى ؕ﴿۷﴾ وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿۸﴾ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۹﴾ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى﴾

‘সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে এবং ভালো বিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ। পক্ষান্তরে কেউ কার্পন্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পরিণামের পথ। (৯২ নং সূরা লাইল, আয়াত নং ৫-১০)

এ আয়াতগুলোতে মুশরিকদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করত। অথচ তারা পূর্ণ মুশরিক ছিল। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: ইবরাহীম (আঃ) তো তাওহীদ মান্যকারীদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাওহীদকে শির্ক হতে পৃথককারী ছিলেন। বরং তিনি প্রত্যেক অংশীবাদীকে ও শির্ককে এবং কৃত্রিম মা ‘বূদকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন:

(قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًاۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ)

“বল, ‘আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।” (সূরা আন ‘আম ৬:১৬১)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা বর্ণনা করে দিলেন, মিল্লাতে ইবরাহীম হল দীন ইসলাম যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ)

“এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, ‘তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। (সূরা নাহল ১৬:১২৩)

সুতরাং যারা ইবরাহীম (আঃ)-এর এ তাওহীদী মিল্লাত থেকে বিমুখ হবে তারা নির্বোধ ছাড়া কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবরাহীম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন যে, তাকে দুনিয়াতে নির্বাচিত বান্দাদের আর আখিরাতে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা ‘আলা তাঁকে যখনই আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন তখনই তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন।

ইবরাহীম (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) তাদের পরবর্তী বংশধরদের যে দীনের ওসীয়ত করে গেছেন তা কোন ইয়াহূদী ধর্ম নয়, কোন নাসরানী ধর্মও নয়। তা হল একমাত্র ইসলাম। এ ব্যাপারে কুরআনে অনেক আয়াত বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ)

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মনোনীত জীবন-বিধান হচ্ছে ইসলাম। আর আহলে কিতাবরা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পরস্পরে বিদ্বেষবশতঃ মতভেদ করেছে। আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।” (সূরা আল ইমরান ৩:১৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ)

“আর যে কেউ ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা তালাশ করবে তার কাছ থেকে কিছুই কবূল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা আল ইমরান ৩:৮৫)

আল্লাহ তা ‘আলা ইয়াহূদীদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বলেন- তোমরা দাবি কর যে, ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) পরবর্তী বংশধরকে ইয়াহূদী ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার অসিয়ত করেছেন। তোমরা কি অসিয়তের

সময় উপস্থিত ছিলে? যদি তা না হয় তাহলে তোমাদের দাবি মিথ্যা ও অহেতুক। বরং সকলেই একটাই দীনের অসিয়ত করেছেন তা হল ইসলাম। যদিও বিধি-বিধানে কিছু পার্থক্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

নাবীরা সকলে বৈমাত্রেয় ভাই, মাতা ভিন্ন কিন্তু সকলের দীন একটাই। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪৪৩)

আল্লাহ তা ‘আলা ইয়াহূদীদের লক্ষ করে আরো বলেন, তোমরা যারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে নিজেদের সঠিক ধর্মের অনুসারী দাবি করছ, তোমাদের ঐ দোহাই দিয়ে লাভ নেই। তারা যা কিছু করেছে তা নিয়ে চলে গেছে। সুতরাং তাদের দোহাই দিয়ে কোন লাভ নেই, প্রকৃত জামিন হল সঠিক ঈমান ও সৎ আমল। যারা এ দু’ টি নিয়ে আসবে তারাই সফলকাম হবে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩১

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তার অবস্থা ছিল এই যে, যখন তার রব তাকে বললো, “মুসলিম হয়ে যাও।” তখনই সে বলে উঠলো, “আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর ‘মুসলিম’ হয়ে গেলাম।”

তাফসীর :

মুসলিম কাকে বলে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয়, আল্লাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে-ই মুসলিম। এ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম ‘ইসলাম’ । মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাঁদের সবার দ্বীন ও জীবন বিধান।

আল্লাহ্ তা'আলার (أسلِم) 'আনুগত্য গ্রহণ কর' সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে (أَسْلَمْتُ لَكَ) আমি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করলাম' বলা যেত। কিন্তু খলীলুল্লাহ 'আলাইহিস সালাম এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, (اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকুলের রবের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারও প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমনটা করাই ছিল আমার প্রতি অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাববুল আলামীন বা সৃষ্টিকুলের রব। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, মিল্লাতে ইবরাহিমীর মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপও এক ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত - যার অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্র এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পৌছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত নবীর অভিন্ন দ্বীন এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। আদম ''আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মিল্লাতে ইবরাহিমীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার দ্বীনের নাম ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দো'আ প্রসংগে বলেছিলেনঃ "হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম) মুসলিম (অর্থাৎ আনুগত্যশীল) করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদলকে আনুগত্যকারী করুন' । ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তার সন্তান্দের প্রতি অসীয়ত প্রসংগে বলেছিলেনঃ তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ করো না। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর পর তারই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলিম। এ উম্মতের দ্বীনও মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের মুসলিম' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে" । [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭৮]

দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে ইয়াহুদী, নাসারা ও আরব-এর মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী দ্বীনের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনই ইবরাহিমী দ্বীনের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত রাসূল আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীআত নাযিল হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হিদায়াতের অনুসরণ। পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলিম এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা দ্বীনের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীআতের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে - যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীআতের অনুসরণ করছে বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোকা দেয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদ পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। [তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন]

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩২

وَ وَصّٰی بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوْبُ ؕ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَكُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

ঐ একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরই উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে। সে বলেছিল, “আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো।”

তাফসীর :

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাত বা দ্বীন ইসলাম তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব ‘আলাইহিমুস সালাম কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ এই যে, সন্তানদের ভালবাসা এবং মঙ্গল চিন্তা রিসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক সময় তার পালনকর্তার ইংগিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য তার পালনকর্তার দরবারে দো'আও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ ইসলাম। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার দামী বস্তু। অথচ নবী-রাসূলগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রপ্তানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায় তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। কিন্তু নবীগণ ও তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বলে মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। আর সেটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উপর অটুট থাকা ও এর একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া। এ জন্য তারা দোআ করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসীয়ত করেন। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নবী-রাসূলগণের এ বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না। নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এরপর অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দুটি রহস্য নিহিত রয়েছে - প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতা-মাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলেঃ “হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর” । [সূরা আত-তাহরীমঃ ৬]

মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল তার হেদায়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ “নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন” [সূরা আশ-শু'আরাঃ ২১৪]

আরও বলা হয়েছেঃ “পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও সালাত অব্যাহত রাখুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১৩২]

মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। তৃতীয়তঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আতীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারকার্যের জবাবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়শকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেলঃ “মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে” । [সূরা আন-নসরঃ ২]

আজকাল দ্বীনহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও দ্বীনী হলেও সন্তানদের দ্বীনী হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা

আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

বনী ইসরাঈল সরাসরি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের বংশধর হবার কারণেই সরাসরি তাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

'দ্বীন' অর্থাৎ জীবন পদ্ধতি ও জীবন বিধান। মানুষ দুনিয়ায় যে আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তার সমগ্র চিন্তা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে তাকেই বলা হয় 'দ্বীন' ।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩৩

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিল?মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলোঃ "আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে?" তারা সবাই জবাব দিলঃ "আমরা সেই এক আল্লাহর বন্দেগী করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত- মুসলিম।"

তাফসীর :

ইয়া 'কূব (আঃ)-এর মৃত্যুর সময়ে নাসীহত

'আরবের মুশরিকরা ছিলো ইসমা 'ঈল (আঃ)-এর বংশধর এবং বানী ইসরাঈলেরা কাফির ছিলো এবং তারা ছিলো ইয়া 'কূব (আঃ)-এর বংশধর। তাদের ওপর প্রমাণ উপস্থিত করে মহান আল্লাহ বলেন যে, ইয়া 'কূব (আঃ) অন্তিমকালে স্বীয় সন্তানগণকে বলেছিলেনঃ

﴿مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ﴾

আমার পরে তোমরা কার ‘ইবাদত করবে?’ তারা সবাই উত্তরে বলেছিলোঃ ‘আপনার ও আপনার মুরব্বীগণের যিনি সত্য উপাসক অর্থাৎ মহান আল্লাহ, আমরা তাঁরই ‘ইবাদত করবো।’ ইয়া ‘কূব (আঃ) ছিলেন ইসহাক (আঃ) এর পুত্র এবং ইসহাক (আঃ) ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র। ইসমা ‘ঈল (আঃ)-এর নাম বাপ-দাদার আলোচনায় বহুল প্রচলন হিসেবে এসে গেছে। তিনি হচ্ছেন ইয়া ‘কূব (আঃ) এর চাচা। ‘আরবে এটা প্রচলিত আছে যে, তাঁরা চাচাকে বাপ বলে থাকে। (তাফসীর কুরতুবী ২/১৪৩) এই আয়াতটিকে প্রমাণরূপে দাড় করে দাদাকেও পিতার হুকুমে রেখে দাদার বিদ্যমানতায় মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা ও ভগ্নিকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ফায়সালা এটাই। যেমন সহীহুল বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে এবং হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর ওপর কোন দ্বিমত নেই। (ফাতহুল বারী ১২/১৯, ২০, সুনান দারিমী ২/৪৫০/৪৫১) উম্মুল মু’ মিনীন ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) এর মতামত এটাই। হাসান বাসরী (রহঃ), তাঊস (রহঃ) এবং ‘আতাও (রহঃ) এটাই বলেন। ‘উমার (রাঃ), ‘উসমান (রাঃ), ‘আলী (রাঃ), ইবনে মাস ‘ঊদ (রাঃ) যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একটি দলেরও একই অভিমত।

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়কে পরিস্কার করার জায়গা এটা নয় এবং তাফসীরের এটা আলোচ্য বিষয়ও নয়। যা হোক ইয়া ‘কূব (আঃ)-এর ছেলেরা স্বীকার করে যে তারা একই উপাস্যের উপাসনা করবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না এবং তাঁর আনুগত্যে, তাঁর আদেশ পালনে এবং বিনয় ও নম্রতায় সদা নিমগ্ন থাকবে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ

﴿وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ﴾ ‘অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্র্পণ করছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৮৩) আহকামের ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও সমস্ত নবীর ধর্ম এই ইসলামই ছিলো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

‘আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এই ওয়াহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ‘ইবাদত করো। (২১ নং সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ২৫) এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত রয়েছে এবং বহু হাদীসও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"نحن مَعْشَرَ الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد". ‘আমরা বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের একই ধর্ম।’ (সহীহুল বুখারী ৬/৩৪৪৩, সহীহ মুসলিম ২/১৪৫/১৮৩৭, সুনান আবূ দাউদ ৪/৪৬৭৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৩১৯, ৪০৬, ৪৩৭, ৪৮২)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ‘এটা একটা দল ছিলো যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমাদের কোন উপকার হবে না। তাদের কৃতকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্য। তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।’ এ জন্যই হাদীসে এসেছেঃ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه

‘যার কাজ বিলম্বিত হবে তার বংশ তাকে ত্বরান্বিত করবে না।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৪/৩৮/২০৭৪, সুনান আবূ দাউদ-৩/৩১৭/৩৬৪৩, জামি ‘ তিরমিযী ৫/১৭৯/২৯৪৫, সুনান ইবনে মাজাহ ১/২২৫/৮২, মুসনাদে আহমাদ ২/২৫২/৭৪২১) অর্থাৎ সে সৎ কাজে বিলম্ব করবে তার বংশ মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবেনা।

বাইবেলে হযরত ইয়াকূবের (আ) মৃত্যুকালীন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে এই উপদেশের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে তালমূদে যে বিস্তারিত উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বিষয়বস্তু কুরআনের এ বর্ণনার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যশীল। সেখানে আমরা হযরত ইয়াকূবের (আ) একথাগুলো পাইঃ “সদাপ্রভু আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকো। তিনি তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বিপদ থেকে বাঁচাবেন যেমন বাঁচিয়েছেন তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে।…… তোমাদের সন্তানদের আল্লাহকে ভালোবাসতে এবং তাঁর হুকুম পালন করতে শেখাও। এতে তাদের জীবনের অবকাশ দীর্ঘ হবে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে হেফাযত করেন যারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে এবং তাঁর পথে ঠিকমতো চলে।” জবাবে তাঁর ছেলেরা বলেনঃ “আপনার উপদেশ মতো আমরা কাজ করবো। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন।” একথা শুনে হযরত ইয়াকূব (আ) বলেনঃ “যদি তোমরা আল্লাহর পথ থেকে ডাইনে বাঁয়ে না ঘুরে যাও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের সাথে থাকবেন।”

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩৪

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এরা ছিল কিছু লোক। এরা তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা কি করতো সে কথা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

তাফসীর :

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না - যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছেঃ "একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না" । [সূরা আল-আনআমঃ ১৬৪. আল-ইসরাঃ ১৫, ফাতিরঃ ১৮, আর্য-যুমারঃ ৭, আন-নাজমঃ ৩৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে বনী-হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন অন্যান্য লোকজন নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাচাতে পারব না। [মুসলিমঃ ২৫৪৩]

অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। [মুসলিম: ২৬৯৯, আবু দাউদ: ১৪৫৫]

অর্থাৎ যদিও তোমরা তাদেরই সন্তান তবুও প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তোমরা তাদের পথ থেকেই যখন সরে গিয়েছো তখন তাদের নাম নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে? আল্লাহর ওখানে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি করতো? বরং জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা কি করেছো?আর "তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য" ---এ বর্ণনাভংগীটি কুরআনের একান্ত নিজস্ব। আমরা যে জিনিসটিকে কাজ বা আমল বলি কুরআন নিজের ভাষায় তাকে বলে উপার্জন বা রোজগার। আমাদের প্রত্যেকটি আমলের একটি ভালো বা মন্দ ফলাফল আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির আকারে এর প্রকাশ ঘটবে। এ ফলাফলই হচ্ছে আমাদের উপার্জন। যেহেতু কুরআনের দৃষ্টিতে ঐ ফলাফলই মূল গুরুত্বের অধিকারী তাই সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাজকে 'আমল' ও 'কাজ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত না করে তাকে 'উপার্জন' শব্দ দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইসলাম বর্জন করে অন্য ধর্ম অন্বেষণ করা বোকামির পরিচয়।

২. মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করা শরীয়তসম্মত। তবে তা যেন কোন জুলুম না হয়।

৩. ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত দাবি সম্পর্কে অবগত হলাম।

৪. সকল নাবীর ধর্ম ছিল ইসলাম এবং এর দিকেই তারা স্বীয় জাতিকে আহ্বান করেছেন।